প্রবাসীদের অন্তর্ভূক্ত করে জাতীয় ঐক্যের পথ

দেশ রক্ষার জন্য প্রবাসীদের প্রকৃত যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দিন

শেখ আলীমুজ্জামান

প্রকাশ: ১৪ অক্টোবর ২০২৪ | ১৮:৪৬

- অ +

আগস্টের গণভ্যুত্থান আমরা প্রবাসীরা দূর থেকে দেখেছি। ভৌগোলিক হিসেবে দূরে থাকলেও হৃদয়ে বাংলাদেশ ধারণ করি বিধায় ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেশবাসীর চেয়ে কম কিন্তু দেখিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবাসীরা যে যার অবস্থান থেকে সদা সক্রিয় ছিলেন। আমার শহর টোকিওসহ পৃথিবীর অনেক শহরের রাস্তায়-চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। এক পর্যায়ে প্রবাসীরা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে, পরিবারের চেয়ে দেশকে প্রাধান্য দিয়ে রেমিট্যান্স পাঠানো সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যাশা ছিল, আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রায় দেড় মাস পর দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে প্রথম সংবাদ সম্মেলন করেন। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে কথা বলার জন্য সময় লেগেছে বলে শুরু করলেও তিনি যা বলেন তাতে কোনো নতুনত্ব আমার কাছে ধরা পড়েনি। বক্তব্যের সারাংশ ছিল, প্রবাসীদের জন্য সেবা ও সুবিধা বৃদ্ধি করে রেমিট্যান্স প্রবাহ ধরে রাখা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করা। এই গৎবাঁধা বয়ান অতীতেও আমরা বহুবার শুনেছি। অতীতের মতো প্রবাসীদের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে গণ্য না করে দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মানুষ হিসেবে তাদের মৌলিক অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা হবে, উপদেষ্টার বক্তব্যে সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না। বরং শ্রুতিমধুর করার জন্য ‘রেমিট্যান্স যোদ্ধা’ নামক একটি বিশেষণ যোগ করা হয়; যা প্রবাসীদের মূল প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করে না। এর একটা কারণ হতে পারে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রবাসীদের কোনো প্রতিনিধি নেই বিধায় তাদের কথাগুলো বলার কেউ নেই। বিগত বছরগুলোয় অনেক প্রবাসী অ্যাক্টিভিস্ট দেশে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র হটিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় ছিলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তাদের কাউকে রাখা যেত। অনেক দেশে নিবেদিতপ্রাণ প্রবাসী সমাজ সংগঠকরা বছরের পর বছর কমিউনিটির কার্যক্রমের সঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ে সম্পৃক্ত, তাদের কাউকে রাখা যেত। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রবাসীদের কেউ না থাকায় সোয়া কোটি প্রবাসীর মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির যে প্রত্যাশা, যার অন্যতম হচ্ছে প্রবাস থেকে জাতীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানের কিংবা জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার, এসব উপেক্ষিত রয়ে গেছে। সংস্কারের রোডম্যাপে এ সম্পর্কিত কোনো পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর প্রধান উপদেষ্টা প্রথমেই বলেছিলেন, আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জাতীয় ঐক্য। অতঃপর ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হলেও জাতীয় ঐক্যের কোনো রূপরেখা এখনও দেওয়া হয়নি, বিষয়টি হয়তো খুব সহজ নয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলিম এবং বাঙালি। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সমস্যা এই দ্বৈত আত্মপরিচয়ের

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সংকট। বরং এ দুই আত্মপরিচয়কে বিভাজনের মাধ্যমে সাংঘর্ষিক অবস্থানে দাঁড় করিয়ে, একে অপরের শত্রু বানানোর অপচেষ্টা চলেছে। আমাদের ভেতরে যারা ইসলাম চর্চায় সক্রিয় ও সোচ্চার, তাদের রাজাকার কিংবা অন্য দেশের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা হয়। অন্যদিকে যারা বাঙালি সংস্কৃতিচর্চায় নিবেধিতপ্রাণ তাদের ধর্মবিদ্বেষী ও আরেক দেশের দালাল বলে হেয়প্রতিপন্ন করার তৎপরতা চলে। স্বার্থান্বেষী কিছু কুচক্রী আমাদের ভেতরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে, আমরা নাকি সুযোগ পেলে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। সেই ভয় আরও ভয়ানক করার উদ্দেশ্যে অন্য দেশ সম্পর্কে ও ভীতি তৈরি করে জাতিগতভাবে একটি নতজানু মানসিকতা তৈরি করা হয়েছে।

এই ভীতি ও নতজানু মানসিকতা পরিত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সামনে যে পথটি খোলা, তা হলো বাংলাদেশের জন্মলগ্ন স্মরণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ করা। তোতা পাখির মতো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বুলি আওড়ানো নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধকে অনুশীলনে ফিরিয়ে আনা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সেনাবাহিনীর শীতকালীন বহিরঙ্গণ অনুশীলনকে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, ছাত্র-জনতা-প্রবাসীদের সংযুক্ত করে জাতীয় অনুশীলনে পরিণত করতে পারলে সেই প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর সমঝোতা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিতি হবে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর দুটো অংশ ছিল, সামরিক-আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে গঠিত ‘নিয়মিত বাহিনী’ এবং তাদের কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-জনতা নিয়ে গঠিত অনিয়মিত ‘গণবাহিনী’। স্বাধীনতার পরের কিছু ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে, সামরিক বাহিনীকে শাসক হয়ে উঠতে দেওয়া যাবে না বলে তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। অথচ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তারাই ছিল জনগণের প্রশিক্ষক ও সহযোদ্ধা এবং সেই ধারাবাহিকতায় এখনও তারাই জনগণের অন্যতম ভরসার জায়গা। গত আগস্টের গণভ্যুত্থানের চূড়ান্ত বিজয় সেনা-গণসমঝোতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে মুক্তিবাহিনীর আদলে সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষক ও সহযোদ্ধার ভূমিকায় ফিরিয়ে এনে জাতীয় সংহতির পরিকল্পনা করা ঐতিহাসিক বিচারে পরীক্ষিত ও ভৌগোলিক বিচারে রণকৌশল সম্মত। নতুন করে অনিয়মিত গণবাহিনী গড়ে তোলার জন্য আপাত নিষ্ক্রিয় মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়কে সংস্কারের আওতায় এনে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। সেনাপ্রধান অন্তর্বর্তী সরকারকে ১৮ মাস সমর্থনের অঙ্গীকার করেছেন, যদিও এই সময়কালের ব্যাখ্যা এখনও আলোচনার বিষয়। তবে এ বছর শীতকাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর শীতকালীন ও বর্ষাকালীন দুটো জাতীয় অনুশীলন করা গেলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেই তিন বা ততধিক অনুশীলন সম্পন্ন হবে। এভাবে সেনা-গণসমঝোতার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে এবং ভীতি, নতজানু মানসিকতা কেটে যাবে।

জাতীয় ঐক্যের এই অনুশীলনে প্রবাসীদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম

অধিবেশনে প্রধান উপদেষ্টা প্রদত্ত ভাষণে ইংগিত রয়েছে। সমকালীন বিশ্ব স্মার্ট প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত। ডিজিটাল প্রযুক্তির মোবাইল ফোনের সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এ-আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত করে সেটাকে জেনেরেটিভ বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও বুদ্ধিমান করা হচ্ছে। এর ফলে যুদ্ধ হয়ে উঠেছে দুই রণাঙ্গনভিত্তিক। একটি ভৌগোলিক যুদ্ধক্ষেত্র, অন্যটি সাইবার রণক্ষেত্র। ক্রমাগত মেধা পাচার ও অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে আমাদের সাইবার ক্ষেত্রটি অত্যন্ত দুর্বল। তাই জাতীয় অনুশীলনের সাইবার ক্ষেত্রে প্রবাসীদের যুক্ত করা হলে ঐক্যের রূপরেখাটি পূর্ণাঙ্গতা পাবে। তথাকথিত রেমিট্যান্স যোদ্ধা নয়, দেশ রক্ষার জন্য প্রবাসীদের প্রকৃত যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। আমাদের এই সামগ্রিক অনুশীলন অন্য কোনো দেশকে আক্রমণ করার জন্য নয় বরং আক্রান্ত হলে সর্বাত্মক আত্মরক্ষার জন্য। ‘পারব না’ বলা বাদ দিয়ে আমাদের ‘হারব না’ বলার সাহস ও সামর্থ্য অর্জন করতে হবে।

ড. শেখ আলীমুজ্জামান: জাপান প্রবাসী সমাজ সংগঠক
sheikhaleemuzzaman@gmail.com

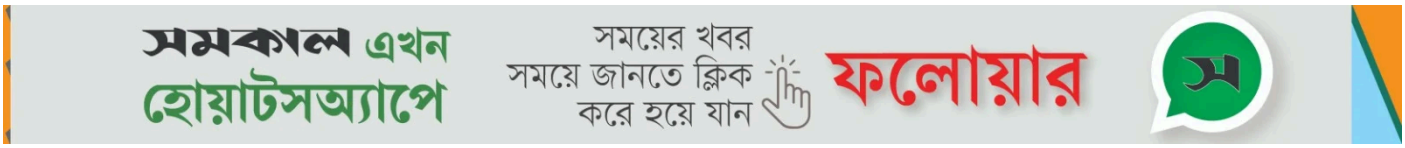

বিষয় : প্রবাসী রেমিট্যান্স

আরও পড়ুন